সাইবর্গ

‘২০৫০ সাল। পারমাণবিক বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেছে পৃথিবীর মানব বসতি। প্রায় দশ বছর ধরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলে এই যুদ্ধ। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়ায় বিষাক্ত হয়ে গেছে বায়ুমন্ডল। বাতাসে শুধুই নাইট্রোজেন। তবে আশ্চর্য হলেও সত্য, এরই মাঝে বেঁচে আছে কিছু মানুষ। তীব্র রেডিয়েশন আর নাইট্রোজেনের মাঝে বেশ অদ্ভুতভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে তারা। হৃদযন্ত্রে বসানো একটি ছোট্ট ফিল্টার দিয়ে তারা বাতাসের নাইট্রোজেনকে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করেছে। মাথায় বসানো আছে কপোট্রোন। কোটি কোটি ইলেকট্রোড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় সব কাজকর্ম। আর্টিফিসিয়াল রেটিনা দিয়ে দেখতে পারে এক্সরে, ইনফ্রা রেড আলো পর্যন্ত। নিজেদের অবশ্য মানুষ বলতে বেশ নারাজ তারা। মানুষ নামের মাঝে কোথায় যেন একটি সুপ্ত হিংস্রতা লুকিয়ে আছে। তারা সবাই সাইবর্গ। প্রযুক্তি আর প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়ায় তৈরি এক নতুন প্রজন্ম’

লিখেছেন **জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল**

সায়েন্স ফিকশনে সাইবর্গ নিয়ে কল্পনার শেষ নেই। হলিউড চলচ্চিত্রে সাইবর্গ নিয়ে তৈরি সবচেয়ে জনপ্রিয় মুভি হলো টারমিনেটর। টারমিনেটরে আর্নল্ড শোয়ারজিনেগরের সেই লোমহর্ষক দৃশ্যের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। যেখানে হাতের মাংসপেশী খুলে বের হয়ে আসে ইস্পাতের তৈরি রোবটিক হাত। এখানে শোয়ারজিনেগর ছিলেন ভবিষ্যৎ থেকে আসা একটি সাইবর্গ। সাইবর্গ কিন্তু মোটেও আর কোন ফিকশন বা কল্পনার মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই। আপনার আমার চারপাশেই রয়েছে অনেক সাইবর্গ। অবাক হচ্ছেন। সাইবর্গ তৈরির প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

ডিকশনারিতে সাইবর্গ-এর অর্থ হলো একজন মানুষ যার এক বা একাধিক ফিজিওলজিক্যাল বা শারীরবৃত্তিয় কাজ নিয়ন্ত্রিত হয় মেকানিকেল বা ইলেকট্রিকেল ডিভাইসের মাধ্যমে। সাইবর্গ হলো প্রাযুক্তিক বিবর্তনে মানুষের উন্নত সংস্করণ। অংশত যন্ত্র, অংশত মানুষ।

বাস্তব কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত

প্রযুক্তিবিদদের ধারণা অচিরেই সায়েন্স ফিকশন ছুঁয়ে যাবে বাস্তবতাকে। ১৯৯৭ সালে টোকিও ইউনিভার্সিটির গবেষকরা একটি তেলাপোকার মোটর নিউরন বা মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রকে জুড়ে দেন একটি মাইক্রো প্রসেসরের সাথে। ইলেক্ট্রোডের মাধ্যমে নিউরনে পাঠানো হয় সিগনাল। আশ্চর্যজনকভাবে তেলাপোকার মস্তিষ্ক ইলেকট্রনিক সিগনালের সাড়া দেয়। এরপরের ধাপে গবেষণা চলছে মানুষের মস্তিষ্কের সাথে তেলাপোকার মস্তিষ্ককে যুক্ত করে তেলাপোকার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিনা। যদি এটি সফল হয় তবে ভবিষ্যতে এভাবে হয়তো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে মানুষের মস্তিষ্ককে!

আটলান্টার ইমোরি ইউনিভার্সিটির ওয়ারউইক এমনি একটি গবেষণা করেন সম্প্রতি। তিনি একজন প্যারালাইজ রোগীর মাথায় স্থাপন করেন একটি ট্রান্সমিটিং ডিভাইস। মোটর নিউরনকে সিলিকনের সাথে যুক্ত করে দেখা গেছে রোগী সম্পূর্ণ চিন্তা শক্তি দিয়ে কম্পিউটারের কার্সর মুভ করতে পারছেন।

জুন ২০০৪, একদল সার্জন ২৪ বছর বয়সী একজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর মাথায় পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপন করেন ব্রেইনগেট

নামের একটি ডিভাইস। এতে ছিল প্রায় ১০০টি ইলেকট্রোড। এটি মাথার মোটর কর্টেক্সে বসানো হয়। প্রতিটি ইলেকট্রোড একটি নিউরনের সাথে যুক্ত থাকে। ডিভাইসটি একই সাথে ১০০টি নিউরনের মধ্যে তথ্য আদান প্রদান করতে সম্ভব। ফলে এটি দিয়ে কোনো কিছু না ধরেই চিন্তা শক্তির মাধ্যমে কম্পিউটারে মেইল চেক করা এবং গেইম খেলা যাবে।

ব্রেইন গেটের মাধ্যমে কম্পিউটার কিংবা টেলিভিশন কন্ট্রোল করা যাবে শুধুমাত্র চিন্তাশক্তির ব্যবহার করে। এমনকি আপনি অন্য কোনো কাজ করছেন তখনো এটি করতে পারবেন। গবেষকরা দেখিয়েছেন যে এটি ব্যবহার করে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী কথা বলছেন পাশাপাশি চিন্তা শক্তি দিয়ে টেলিভিশন নিয়ন্ত্রণ করছেন। সত্যি অবাক করার মতো বিষয়।

গবেষকরা এখন এটি আরো চারজন রোগীর মাথায় স্থাপন করে এর কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখছেন। সফল হলে এটি হবে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। এটি প্রযুক্তিকে করবে আরো উন্নত এবং গতিময়। একবার চিন্তা করুন ১০০টি ইলেক্ট্রোডের পরিবর্তে যদি আরো বেশি ইলেক্ট্রোড ব্যবহার করা যেত তবে আরো অধিক সংখ্যক নিউরন থেকে তথ্য পাওয়া যেত। এতে বিষয়টি হতো আরো অনেক বেশি নির্ভুল।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে গবেষণায় কর্মরত রয়েছেন স্টিফেন রবার্ট। তার গবেষণা বিষয় হলো ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস। তার মতে, শেষ পর্যন্ত এমন একটি বিষয় ডেভেলপ করা হবে যা ব্যবহারের জন্য রোগীকে কোনো ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হবে না। তবে এজন্য আরো অনেক বেশি গবেষণা প্রয়োজন।

থমাস ডিমার্স নামে ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটির একজন বিজ্ঞানী কাজ করেছেন এক জীবন্ত মস্তিষ্ক নিয়ে যা সিমুলেটেড বিমান চালনায় পারদর্শী। মস্তিষ্কটিতে ছিল ২৫০০০টি জীবন্ত নিউরন এবং এটি সংগ্রহ করা হয় একটি ইঁদুরের মাথা থেকে। একটি পাত্রের ওপর সাজানো একাধিক ইলেকট্রিক গ্রিডের ওপর রাখা হয় এই মস্তিষ্কটিকে। দেখা যায়, মস্তিষ্কের নিউরন খুব দ্রুত একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করে জীবন্ত এক নিউরাল নেটওয়ার্ক। এটিকে এরপর একটি কম্পিউটারের সাথে ইন্টারফেস করা হয়। নিউরাল নেটওয়ার্ক কম্পিউটারের সাথে দ্বিমুখী সিগনাল আদান প্রদান শুরু করে দেয়। এই সিগনাল ব্যবহার করে

শিল্পীর কল্পনায় ভবিষ্যৎ মানুষের প্রতিকৃতি

‘মানবজন্ম একটা দুর্ঘটনা, আমি সাইবর্গ হতে চাই’

কেভিন ওয়ারউইক, বিশ্বের প্রথম সাইবর্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইবারনেটিকস নিয়ে বহুদিন গবেষণা করে আসছেন প্রফেসর কেভিন ওয়ারউইক। তার মতে, মানুষ হিসেবে জন্ম নেয়াটা শুধুই একটি ভাগ্যের বিড়ম্বনা। এবং নিরন্তর গবেষণার মাধ্যমে তিনি নিজেকে পরিণত করেন পৃথিবীর প্রথম সাইবর্গরূপে সার্জনরা দীর্ঘ অপারেশনের মাধ্যমে তার নার্ভাস সিস্টেমকে সফলভাবে জুড়ে দেন কম্পিউটারের সাথে। এর ফলে আঙ্গুলের নড়াচড়া কিংবা যেকোন ধরনের অনুভূতি কম্পিউটারে ট্রান্সমিট হয়ে রেকর্ড হয়ে থাকতো। ওয়ারউইক বিশ্বাস করেন তার এই অবদান ভবিষ্যৎ সায়েন্স ফিকশন দুনিয়ার সাইবর্গ তৈরিতে অগ্রজ ভূমিকা রাখবে। যেখানে মানুষের ব্রেইনকে প্রয়োজনমতো আপগ্রেড করা যাবে, যোগ করা যাবে বাড়তি মেমোরি, বুদ্ধিমত্তা কিংবা এক্সরে ভিশন।

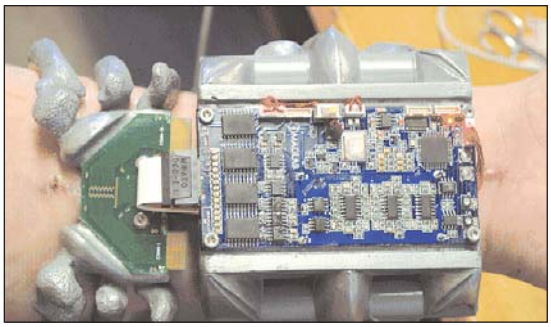

ওয়ারউইকের পাগলামো শুধু এটুকুর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি প্রশিক্ষিত সার্জন দিয়ে দীর্ঘ দুই ঘন্টা অপারেশন করে তার বাম হাতের কব্জিতে স্থাপন করেন ১০০টি ইলেক্ট্রোড যুক্ত ৩মিমি প্রশস্ত সিলিকন চিপ। এটি রেডিও সিগনাল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। চিকিৎসকরা আশংকা করেছিলেন, এতে করে কাজের কাজ কিছুই হবে না, উল্টো প্রফেসরের বাম হাত চিরতরে অবশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রফেসর সফল হোন এই অপারেশনে। তিনি স্বাভাবিক মানুষের মতোই আঙ্গুল নাড়াচাড়া করতে পারেন। পাশাপাশি নিউরাল ইন্টারফেস ব্যবহার করে ওয়ারউইক নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হোন একটি ইলেকট্রিক হুইলচেয়ারসহ বিভিন্ন আর্টিফিসিয়াল যন্ত্র। এটি হাতের মুভমেন্টের সমস্ত সিগনাল পরিমাপের পাশাপাশি আর্টিফিসিয়াল অনুভূতি পর্যন্ত রেকর্ড করে রাখে। ওয়ারউইক টিম এখন কাজ করছেন আনন্দ-বেদনার অনুভূতি এবং এজন্য দায়ী সিগনাল নিয়ে। এটি সফল হলে যখন আপনার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত থাকবে তখন মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়া হবে আনন্দের নির্দিষ্ট সিগন্যাল। তার এই গবেষণা অনেক বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হলেও প্রফেসর ওয়ারউইক বেশ গর্বিত তার নতুন সাইবর্গ পরিচয় নিয়ে।

কম্পিউটারে চালানো হয় এফ২২ ফাইটার জেট বিমানের ফ্লাইট সিমুলেটর প্রোগ্রাম। নিউরন ডাটা বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত সিগনালের প্রতিক্রিয়া পাঠায় ফিডব্যাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ধীরে ধীরে অসংখ্য ট্রায়াল এন্ড এররের মাধ্যমে মস্তিষ্ক শিখে নেয় বিমান চালনার কৌশল। এটি জীবন্ত মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণায় মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করে। একটি ইঁদুরের জীবন্ত মস্তিষ্ক যদি অল্প সময়ের মধ্যে শিখে নিতে পারে বিমান চালনা কৌশল তবে একবার ভাবুন মানুষের নিউরন কোষ কি কান্ড ঘটাতে পারে?

ড. আমির কারনিল একজন ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ার। তার গবেষণার ক্ষেত্র নিউরাল মোটর কন্ট্রোল। তিনি এ বিষয়ে অসংখ্য গবেষণা করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাছের ব্রেইন বা মস্তিষ্ক দিয়ে রোবট নিয়ন্ত্রণ। এজন্য তিনি লেমপ্রি (বান জাতীয় মাছ) থেকে মস্তিষ্ক আলাদা করেন। এটিকে তিনি জীবন্ত রাখতে অক্সিজেনেটেড লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখেন। পাত্রের এক পাশে যুক্ত ছিল অসংখ্য ইলেক্ট্রোড। এবার তিনি চাকাওয়ালা একটি রোবটের সাথে জুড়ে দেন এই জীবন্ত মস্তিষ্ককে। রোবটটির চারপাশ লাইট বাল্বের একটি রিং দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। যখনই কোনো বাল্ব জ্বলে ওঠে রোবটটি মস্কিষ্কে এই সিগনাল পাঠিয়ে দেয়। মস্তিষ্ক এই ডাটা বুঝে পাল্টা সিগনাল পাঠায় এবং আলোর দিকে রোবটটিকে মুভ করতে একটি কমান্ড পাঠায়। সত্যি অবাক করার মতো বিষয়।

তবে কি শীত নিদ্রার মাধ্যমে বিশেষ ক্যাপসুলে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হাজার বছর। সায়েন্স ফিকশন বুঝি সত্যি হতে চললো এবার।

কৃত্রিম রেটিনা

যুদ্ধ যত না প্রাণ নেয়, তারচেয়ে বেশি দেয় অসুস্থ, প্রতিবন্ধী মানুষ। খোদ আমেরিকায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন প্রায় ১.৩ বিলিয়ন আমেরিকান। একটি গবেষণা রিপোর্টে এটি দেখা গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে বসে নেই প্রযুক্তিমনা মানুষ। সম্প্রতি দুর্ঘটনাজনিত কারণে দৃষ্টিহীনদের চোখে স্থাপনের উপযোগী একটি কৃত্রিম রেটিনা তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে কয়েক দশক আগে যারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, তারা পুনরায় তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারেন। গবেষকগণ ইতোমধ্যে এই রেটিনার একটি সংস্করণ বাজারজাত করতে শুরু করেছেন, যেটাতে প্রায় ১০০০টি ইলেকট্রোড রয়েছে এবং এটাকে বর্তমানে ১৮ মাসের ক্লিনিক্যাল বা প্রাথমিক ব্যবহারে রাখা হয়েছে। কৃত্রিম রেটিনা তৈরির এই প্রজেক্টের

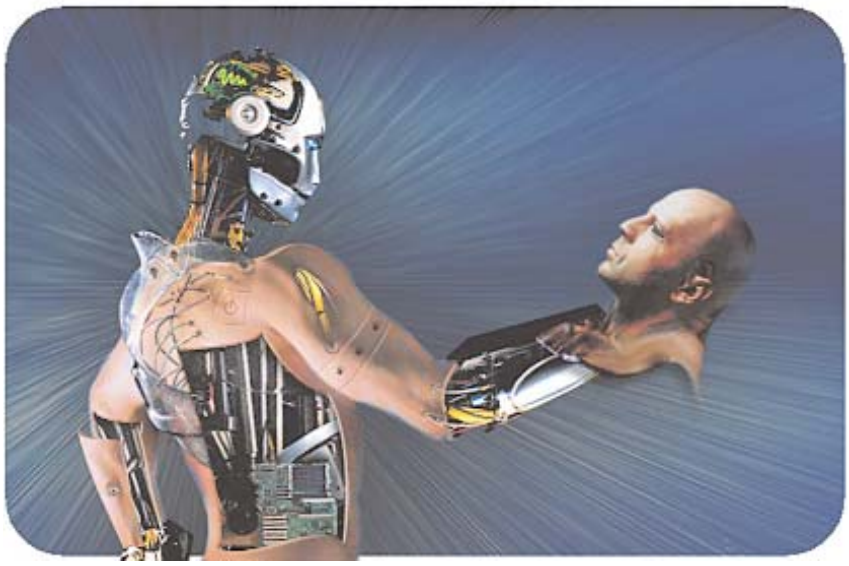

মূল লক্ষ্য হলো- একজন অন্ধব্যক্তি যাতে লিখতে/পড়তে এবং ঘরের প্রাথমিক কাজকর্ম সহজেই করতে পারে। তবে এটিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এটি ব্যবহার করে কেউ গাড়ি চালাতে পারবেন না, সেজন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

এই কৃত্রিম রেটিনা চোখের ভিতরে কিংবা বাইরে উভয়স্থানেই বসানো যায়। রোগীরা সাধারণত চোখে একজোড়া গগলস্ পরিধান করেন, যাতে একটি ক্ষুদ্র ভিডিও ক্যামেরা থাকে। ক্যামেরা বস্তুর দৃশ্যসমূহ ধারণ করে এবং এই সব ডাটা একটি ভিজুয়াল ইউনিটে পাঠায়। ভিজুয়াল ইউনিটে রয়েছে একটি মাইক্রো প্রসেসর যেটা একটি মোবাইল ফোনের মতো আকার এবং যেটাকে একটি বেল্ট প্যাকে আটকে রাখা যায়। মাইক্রো প্রসেসর এই ডাটাকে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে পরিণত করে এবং রোগীর কাচের সাথে যুক্ত যন্ত্রে ট্রান্সমিট করে। এটি চোখে সংযুক্ত রিসিভার এন্টেনাতে সিগনাল পাঠায়। এই সিগনাল রেটিনার সকল কোষকে উজ্জীবিত করে তোলে। এই সকল কোষ পরবর্তীতে অপটিক নার্ভের মাধ্যমে ইমেজকে মস্তিষ্কে পাঠায়। ফলে পরবর্তীতে একটি দর্শন অনুভূতি জন্মে।

এই দর্শন ব্যবস্থায় ১০০০টি ইলেকট্রোডের একটি সজ্জা বিন্যাস থাকে। এই ইলেকট্রোডের ব্যাস ৪০০০ মাইক্রোমিটার।

কৃত্রিম রেটিনা আবিষ্কারের ক্ষেত্রে রয়েছে অনেক সীমাবদ্ধতা এবং এই সঙ্গেও রয়েছে এটার কিছু শারীরিক সমস্যাও। আশার কথা, বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, ভবিষ্যতে এমন ধরনের কৃত্রিম রেটিনা আবিষ্কার করবেন যেটা সকল সমস্যা মুক্ত হবে। এবং এর ফলে কোটি কোটি মানুষ তাদের অন্ধত্ব দূর করে সুন্দর এই পৃথিবীর যা কিছু ভালো তা উপভোগ করতে পারবেন।

কৃত্রিম হৃদযন্ত্র

অক্টোবর, ২০০৪। ফেডারেল রেগুলেটর বোর্ড প্রথমবারের মতো মানুষের দেহে কৃত্রিম হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপনের অনুমোদন দেয়। এটি একটি মেকানিকেল ডিভাইস যা অচল হৃদযন্ত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। এর ফলে ঠেকানো গেছে অসংখ্য মৃত্যু।

একটি সফল কৃত্রিম হৃদযন্ত্র স্থাপনে খরচ হয় ১০০,০০০ ডলার। বুঝতেই পারছেন, প্রযুক্তির উৎকর্ষতার প্রাথমিক সুবিধা কারা ভোগ করতে যাচ্ছে। এখন গবেষণার মাধ্যমে যদি এমন সাইবর্গ তৈরি করা যায় যা চিন্তাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, তবে এই সুবিধা লুফে নিবে সমাজের উচ্চবিত্তরা। মনুষ্য সভ্যতা আবার প্রবেশ করবে ক্রীতদাস প্রথায়। আমরা যদি একে অপরের চিন্তা পড়তে পারি তবে কেউ মিথ্যা বলতে পারবে না-বিষয়টি ভালো না খারাপ? পেশীশক্তি আর প্রযুক্তির বলে মানুষ হয়ে উঠবে আরো হিংস্র। সাইবর্গ তৈরির পাশাপাশি এসব দিক নিয়ে ভাবিত গবেষকরা। তবে একথাও সত্যি, প্রযুক্তির কল্যাণে ভবিষ্যতের পৃথিবীতে থাকবে না কোন শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষ। মানুষ তার অসম্পূর্ণতাকে জয় করবে, দূর করবে জরা, ব্যাধি আর মানসিক অসুস্থতাকে।

Data Recovery

Computer HDD-এর Data Recover এবং M/B-এর BIOS Write করা হয়

যোগাযোগ: PC LAB

Tel : 8631281, 0191385441